তারিখ ...29 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ১......

সংবাদ

প্রশ্নপত্র ফাঁসে লঘু দণ্ডের বিধান ও এলাকা কোটা প্রসঙ্গে

শরীফুর রহমান আদিল

প্রশ্নপত্র ফাঁস, বর্তমান বাংলাদেশে সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক এক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে শুরু করে কোমলমতি শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি বর্তমানে একটি তিক্ত ও নির্মম বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলে বলা যায় এটি একটি বাংলাদেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে সর্বপ্রথম মেট্রিকুলেশান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। সেই যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সূর্য উদিত হয়েছে এখনও তা অস্ত যায়নি। তবে ১৯৭৯ সালে এর সূর্য উদিত হলেও এটি পূর্ণাঙ্গ কিরণ দেয় ২০১১ সাল থেকে। এসময় থেকে এমন কোন বছর নেই যে সময়ে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি পিএসসি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সরকারি চাকরি এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সবই এদেশে ফাঁস হয়েছে, ফাঁসকারীরা ধরাও পড়েছে কিন্তু হয়নি শুধু কোন বিচার তাই পরের বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আবার এই ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে অনেকে হয়েছে কোটিপতি। বিনা পারিশ্রামিক আর বিনা কষ্টে কোটিপতি হওয়া গেলে এবং কোন শাস্তি না পাওয়া গেলে এ পথে মানুষ আসতে উৎসাহিত হবে না কেন? কিন্তু প্রশ্ন হলো এভাবে ঢালাওভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে রাষ্ট্র আমাদেরকে কি উপহার দিচ্ছে? আগামী দিনে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত আর উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই সর্বজায়গায় প্রকৃত মেধাবীদের নিয়োগ দিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় সরকারের নেয়া যাবতীয় ভিশন-মিশন ভেস্তে যেতে পারে। যাইহোক, ১৯৭৯ সালে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর ১৯৮০ সালে সরকার একে নিয়ন্ত্রণ করতে একটি পাবলিক পরীক্ষা আইন প্রণয়ন করে। প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয় এবং ১৯৯২ সালে তা কমিয়ে ৪ বছরে নামিয়ে আনা হয় যদিও তখন প্রশ্নপত্র ফাঁস ততটা আলোচিত ছিল না। সবার মুখে একটা ধ্বনিই উচ্চারিত হচ্ছে, আর তা হলো- এ ধরনের প্রশ্ন ফাঁসের সংস্কৃতি থেকে জাতি কবে মুক্তি পাবে? সবারই আশা ছিল সরকার দেশ-জাতি এবং মেধাবীদের স্বার্থ রক্ষায় একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখে একটি আইন করবেন বা, বিদ্যমান আইনের সংশোধন করবেন। সরকার বিদ্যমান আইনের সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাতে মেধাবী ও দেশবাসীর ন্যায্য দাবির পরিবর্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের স্বার্থই মনে হয় রক্ষা করা হচ্ছে অর্থাৎ ১৯৮০ সালের আইনের শাস্তি ১০ বছর থেকে নামিয়ে ৪ বছরে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় অত্র আইনের ৬৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে- কোনো ব্যক্তি পাবলিক পরীক্ষার কোন প্রশ্ন ফাঁস করলে অথবা, জড়িত থাকলে অথবা, সহায়তা করলে তিনি সর্বোচ্চ চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১ লাখ টাকা অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অথচ, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন জেল চেয়ে হাইকোর্টে এক আইনজীবী একটি রিট করেছিলেন যা এখনও শুনানি হয়নি। সংশোধনীতে আনা ধারার ফলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই আইনের মাধ্যমে সরকার কি প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের উৎসাহ দিচ্ছে? অথবা, এটাকে লঘু অপরাধ মনে করছে? নাকি একে একটি ব্যবসা বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে? আবার আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে বারংবার সংঘটিত হওয়া কোন বিদ্যমান আইন কে যেখানে কঠোর করা প্রয়োজন সেখানে আইনটির শাস্তি কমানের চিন্তা অপরাধ বৃদ্ধিও প্রবণতাকে সমর্থন দিচ্ছে না তো? এই আইনের ফলে অন্যান্য অপরাধমূলক আইনের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়বে না তো?

কিন্তু উপরোক্ত সংশোধনীর সাজা ও আর্থিক দণ্ড যদি কমানো হয় তবে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটবে এবং অপরাধীরাও আরও বেশি এ ধরনের বেআইনি কাজ করতে উৎসাহ পাবে। কেননা এক তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে গত পাঁচ বছরে প্রশ্নপত্রে জড়িত এমন লোকদের গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় ২৫০ জনের অধিক কিন্তু কয়েকজন ছাড়া আর কেউ কারাগারে নেই তবে এটি সত্য যে অপরাধীরা গ্রেফতার হলেও এখনও বিচার হয়নি কারোরই। বরং, সবাই দুর্বল আইনের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে এবং পুনরায় একই কাজে জড়িত হয়েছে। আবার ১৯৮০ সালের পর ২০০৩ সাল পর্যন্ত এটি মোটামোটি সহনীয় পর্যায়ে থাকলে এরপর থেকে এটি একটি মহামারী আকার ধারণ করে। গত ৫ আগস্ট টিআইবির সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রায় ৬৩টি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে তথ্য প্রদান করেন। এতেই বুঝা যায় প্রশ্ন ফাঁস দিনে দিনে কেমন জ্যামিত্যিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার সুবাধে অপরাধীরা একে বিভিন্ন অপরাধমূলক অশুভ কাজে ব্যবহার করে বিজ্ঞানের এসব অর্জন আর আবিষ্কারকে মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

আবার সংশোধনীতে যে অর্থদণ্ডের কথা বলা হয়েছে অনেকে একে অনেক কম বলে মনে করেন কেননা প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীরা যেখানে প্রতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয় ১- ২০ টাকা সেখানে ১ লাখ টাকা তো অপরাধীদের জন্য কিছুই না। অন্যদিকে ১৯৮০ বা, ১৯৯২ সালে যখন এইআইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তখন প্রযুক্তির ব্যবহার অতটা ছিল না কিন্তু প্রযুক্তির উৎকর্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ধরনের ঘটনা পুনরায় ঘটবে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। আবার আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, আইন তো সেরকম হওয়া উচিৎ যাতে সংশ্লিষ্ট অপরাধ কমানোর ক্ষেত্রে প্রণীত আইনটি মানুষের মনে এক ধরনের ভয়ের সঞ্চার হয় এবং এই অপরাধ করা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়, কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের যে আইনের খসড়া করা হয়েছে তাতে এই ধরনের কোন কিছু লক্ষ্য করা যায়নি। আমরা জানি শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপরোক্ত আইনটি খসড়া আকারে প্রকাশ করে তাতে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে মতামত দেয়ার জন্য আহ্বান করেছেন তাই আমাদের আশা সরকার বিশেষজ্ঞদের দেয়া মতামতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে অথবা, পূর্বের ন্যায় ১০ বছরের জেল এবং ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বিধান রেখে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন এবং দেশ- জাতি, মেধাবী শিক্ষার্থী সর্বোপরি পুরো বাংলাদেশকে এ ধরনের কলঙ্ক আর মেধাশূন্য করার অপতৎপরতা থেকে মুক্তি দেবেন।

এবার আসি শিক্ষার্থী ভর্তি ও এলাকা কোটা নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী গত কিছুদিন আগে শিশু শ্রেণীতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের কথা বলেছেন যা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ কেননা এসব কোমলমতী শিক্ষার্থীদের এর আগে কোচিং করানোর নামে তাদের খেলাধুলা আর স্বাভাবিক বিকাশের সময়টি পর্যন্ত ঠিকভাবে দেয়া হতো না আর একগাদা বই ঝুলিয়ে কোচিংয়ে নেয়া হতো বইয়ের ভারে কোন কোন শিশুকে মাটিতে পড়ে যেতেও দেখা গেছে। এবার থেকে মাধ্যমিকে এলাকা কোটায় ৪০ শতাংশ মিক্ষার্থী ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে এটি এক হিসেবে একটি ভালো উদ্যোগ কেননা, দিনে দিনে যে পরিমাণ অভিভাবক ও শিক্ষার্থী নিজ গ্রাম রেখে শহরাঞ্চলে পাড়ি জমাচ্ছেন তার ৮০ শতাংশই হলো এই শিক্ষা বা, ভর্তি নিয়ে। এতে করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কখনো কখনো যে শিক্ষার্থী না পাওয়ার অভিযোগ শোনা যায় তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। অন্যদিকে ঢাকাকে আগামী দিনে কিছুটা হলেও যানজট মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। ফলে ঢাকাকে যানজটমুক্ত রাখার আরও একটি নতুন ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে। তবে এই সিদ্ধান্তের ফলেও কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন :

এতে করে তদবির ও ভর্তিবাণিজ্য বেড়ে যেতে পারে সঙ্গেসঙ্গে এই সিদ্ধান্তের ফলে ভালো ও নামকরা যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে তার আশপাশের বাড়ি বা, বাসা ভাড়া অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। এছাড়াও এখানে এলাকা বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করে নির্দেশনা দেয়া উচিৎ কেননা কোন পদ্ধতিতে কি ভিত্তিতে একটি পরিবারকে স্কুলের আশপাশের এলাকায় থাকলে তাকে ঐ এলাকার বাসিন্দা বলে গণ্য করা হবে তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। অন্যদিকে, একই এলাকায় বা, একই ওয়ার্ডে দুই বা, তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও থাকে তবে এদের মধ্যে কোন কোনটি একটু ভালো তবে সেখানে কিভাবে এলাকা নির্ধারণ করা হবে অথবা, এক্ষেত্রে কারা কি পদ্ধতিতে কোন স্কুলে ভর্তি হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট করা দরকার।

[লেখক : শিক্ষক]
adil_jnu@yahoo.com